প্রথম আলো

তারিখ 2-6-SEP-2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

শিক্ষা ও পরীক্ষার কী হবে?

বন্যা-পরবর্তী চিন্তা

সৌমিত্র শেখর

দেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা আর সবকিছুকে দ্রবীভূত করেছে। তাই অতিসম্প্রতি হয়ে যাওয়া ভয়াবহ বন্যার আলোচনা যেন খানিকটা গৌণ হয়ে পড়েছে। অথচ বন্যার রেশ এখনো সার্বিকভাবে মিলিয়ে যায়নি। স্মৃতির পরিধিতে থাকা ১৯৮৮ সালের বন্যাকেও যেন হার মানিয়েছে এবারের বন্যা। তারপরও এই বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব মেলাতে যাঁরা ব্যস্ত, তাঁদের অনেকেই ভৌত অবকাঠামোকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশি। পত্রিকান্তরে বেরিয়েছে, বন্যায় সড়ক-মহাসড়কের ব্যাপক ক্ষতি, কৃষি খাতের সর্বনাশ, গবাদিপশু নিয়ে হাহাকার, রেলওয়ের বিপর্যয় ইত্যাদি। লেখা হয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে ক্ষতির আশঙ্কা। নিশ্চয়ই, বাংলাদেশের মতো স্বল্প আয়ের মানুষের দেশে এই ক্ষতি অঙ্কের হিসাবে অনেকই। কিন্তু পত্রিকায় একই সঙ্গে প্রকাশ পায়নি শিক্ষাক্ষেত্রে কতটুকু ক্ষতি হলো এবং তা পুষিয়ে উঠবে কীভাবে? যদি তা পুষিয়ে ওঠা না যায়, তাহলে বন্যাপীড়িত এলাকার শিক্ষার্থীদের ওপর কুপ্রভাব পড়বে ধীরে ধীরে এবং তা কম ভয়াবহ হবে না।

সাম্প্রতিক বন্যায় দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তিন ধরনের ক্ষতির আওতায় ছিল। যেমন:

এক. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগতভাবে 'ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে' এমন;

দুই. অবকাঠামোগতভাবে তেমন ক্ষতি হয়নি, কিন্তু দীর্ঘ সময় 'পাঠদান বন্ধ ছিল' এমন;

তিন. বন্যার কারণে 'বিলীন হয়েছে' এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, ২১ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত বন্যাকবলিত জেলাগুলোতে ৩ হাজার ৭২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগতভাবে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে এবং ১ হাজার ৫৫৮টি প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ ছিল। পাঠদান বন্ধ থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে গণনা করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে সমুদয় ক্ষতির পরিধি বেশ বড়। আবার বন্যার পানিতে বিলীন হওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা এখনো ঠিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। সব

> পত্রিকায় একই সঙ্গে প্রকাশ পায়নি শিক্ষাক্ষেত্রে কতটুকু ক্ষতি হলো এবং তা পুষিয়ে উঠবে কীভাবে?

মিলিয়ে এ কথাই বলা চলে, বন্যা-পরবর্তীকালে আর সব নিয়ে হিসাব হলেও শিক্ষা-শিক্ষার্থী-পরীক্ষার্থীদের নিয়ে ভাবনার মাত্রাটি আমাদের যেন একটু কমই।

দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দেশে এখন চারটি পাবলিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অবতীর্ণ হতে হয়। পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, অষ্টম শ্রেণিতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, দশম শ্রেণিতে মাধ্যমিক আর দ্বাদশ শ্রেণিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সাধারণত নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। ধরেই নেওয়া হয়, নভেম্বরের প্রথম রোববার জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হবে। এরপর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, তারপর মাধ্যমিক, পরে উচ্চমাধ্যমিক। এবারও পরীক্ষা তো ঠিকই হবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো, এখানে সমান প্রতিযোগিতা হবে কীভাবে? আর উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রতিযোগিতামূলক পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় বন্যাকবলিত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা দক্ষতা দেখাবে কীভাবে? যে ৩ হাজার ৭২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিংবা যে ১ হাজার ৫৫৮টি প্রতিষ্ঠানে অনির্ধারিতভাবে পাঠদান বন্ধ ছিল, সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় 'ভালো' করার ক্ষেত্রটি সংকুচিত হয়ে গেছে। তারা তো বন্যার সময় পড়তেই পারেনি। অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট থেকে মেডিকেল বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নম্বর যুক্ত হয়। যারা এই দুই পরীক্ষায় গ্রেড পয়েন্টে পিছিয়ে থাকবে, তারা উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও পিছিয়ে যাবে নিশ্চয়।

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পরপরই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বছর সমমানসহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছিল ২৮ লাখ ৫০ হাজার জন, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমানের পরীক্ষা দিয়েছিল ২৪ লাখ ১২ হাজার পরীক্ষার্থী, মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল ১৭ লাখ ৮৬ হাজার জন আর উচ্চমাধ্যমিকে ও সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৮৩। এবারের সংখ্যা যথাসময়ে পাওয়া যাবে। তবে সংখ্যা আকাশ-পাতাল পার্থক্য হবে না। সেটাকে মাথায় রেখে পাবলিক পরীক্ষার কথা বিচার করলে বলতে হয়, প্রতিটি বন্যাকবলিত এলাকার পরীক্ষার্থীরা আছে মহাবিপদে। কারণ, তাদের প্রতিষ্ঠান শুধু বন্ধই থাকেনি, অনেকের বই-খাতাসহ শিক্ষাসরঞ্জাম গেছে ভেসে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সংখ্যাতেই আসি: ১ হাজার ৫৫৮টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতি শ্রেণিতে গড়ে যদি ৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে, তাহলে প্রতি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হয় ৫০০ আর বন্ধ থাকা ১ হাজার ৫৫৮টি প্রতিষ্ঠানে সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ লাখ ৭৯ হাজার। শুধু চারটি পাবলিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থী হয় আনুমানিক ৩ লাখ ১১ হাজার ৬০০ জন। এই সংখ্যাটি বিজ্ঞ-অনুমানভিত্তিক আমাদের গবেষণার ফল। দুটো ক্ষেত্রেই সংখ্যাটি উল্লেখকৃতের কম হবে না। তাই বলতে হয়, এত বড় অঙ্কের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতিকে অস্বীকার করা যায় না!

এ পর্যায়ে তাই করণীয় সম্পর্কে ভাবা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের আবার বই সরবরাহ করা (এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসও বটে); দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা যেহেতু নভেম্বর থেকে আরম্ভ হবে এবং হাতে সময় একেবারেই নেই, সেহেতু চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রশ্ন প্রণয়নের ব্যাপারে পুরো বইকে আওতায় না আনা এবং শেষ দিকের কয়েকটি অধ্যায়কে প্রশ্নমুক্ত রাখা; তৃতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণের ব্যবস্থা করা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সরকারের পক্ষ থেকে ভাতা প্রদান; চতুর্থত, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার সাধন করা।

● সৌমিত্র শেখর: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
scpcdu@gmail.com

পরিচালকের কার্যালয়
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর